গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা | ২৪ - ৩০ জুলাই ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধতায়

হিন্দু মহাসভা-মুসলিম লিগ এক সুর

কেন্দ্রের পর রাজ্যেও ক্ষমতায় বসার পর ইতিহাস বদল করার এক ব্যাপক পরিকল্পনা কার্যকর করতে নেমেছে বিজেপি। শুরু হয়েছে ইতিহাসের নতুন নির্মাণ। এই প্রেক্ষাপটে কষ্টিপাথর হিসাবে কাজ করতে পারে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। যাচাই করে নেওয়া যায় স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন দল এবং নেতাদের ভূমিকা। আগামী ৯ আগস্ট এই আন্দোলনের ৮৫তম দিবস। এই উপলক্ষে একবার তাকানো যাক সেই ইতিহাসের দিকে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

বহু বছর ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল দেশজোড়া এক ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান। দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ফলে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন কার্যত পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। এর বিরুদ্ধে মানুষের মনে জমা হয়েছিল প্রবল অসন্তোষ। ১৯০৫ থেকে শুরু করে দেশের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণে স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই যখন ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে চলেছে, তখন বারে বারে কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার ঘটনাও জনমনে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। এই অসন্তোষই দেশজোড়া আন্দোলনের আকারে ফেটে পড়েছিল, যা 'ভারত ছাড়ো' বা 'আগস্ট আন্দোলন' নামে খ্যাত। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের পর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মতো এত ব্যাপক গণজাগরণ ভারতে আর ঘটেনি।

এই আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য— এই সংগ্রামে কোনও নেতার কোনও নির্দেশ ছিল না। কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছিল না। কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। এক স্থানে লড়াইয়ের সঙ্গে অন্য স্থানের লড়াইয়ের যোগাযোগ ছিল না। থাকলেও তা ছিল খুবই ক্ষীণ এবং কংগ্রেসের মঞ্চকে ভিত্তি করেই। ভারতের ইতিহাসে আগস্ট আন্দোলন এক স্বতঃপ্রণোদিত জনজাগরণ। এক দিকে পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্য দিকে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে রয়েছে এই আন্দোলন। এমন নেতৃত্বহীন গণআন্দোলন ইতিহাসে খুবই কম। বাস্তবে এই আন্দোলনে ছিল— জনতাই নেতা।

১৯৪২-এর ৮ আগস্ট মুম্বইতে এআইসিসি-র অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দাবি করা হয়, ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং সেই সরকারের নেতৃত্বে ব্রিটিশের স্বাধীন মিত্রের মতো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হোক। গান্ধীজি বললেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না। ... এই মন্ত্র আপনাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হোক, প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রকাশিত হোক। মন্ত্রটি হল— হয় আমরা ভারতকে স্বাধীন করব, না হয়তো এই চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব।

আন্দোলনের নামে কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্রিটিশের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা

'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হল। নেতারা সংগ্রামের ডাক দিলেন। কিন্তু এই সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হল না। ইংরেজ ভারত না ছাড়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালানোর জন্য জনতাকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে প্রস্তুত করার দরকার ছিল, তা করা হল না। এই সংগ্রাম যে দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা বুঝে জনতাকে সে ভাবে প্রস্তুত করা হল না। নেতারাও গ্রেফতার এড়িয়ে দীর্ঘদিন সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন না। প্রবল অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে এতবড় সম্ভাবনাপূর্ণ সংগ্রামকে কেবল স্বতঃস্ফূর্ততার উপর ছেড়ে দেওয়া হল।

হয়তো কংগ্রেস নেতৃত্বের ধারণা ছিল, এ আন্দোলন তাঁদের শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই করতে হবে না। তাই আন্দোলনের হুমকির ভাষা যতখানি কঠোর ছিল আন্দোলনের সাংগঠনিক পরিকল্পনা তার ধারেকাছেও ছিল না। আন্দোলন শুরুর কোনও নির্দিষ্ট দিনও নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়নি। ৮ আগস্ট মুম্বইয়ে কংগ্রেস কমিটির বৈঠক শেষে গান্ধীজি বললেন, আমি আন্দোলন শুরুর আগে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। অর্থাৎ তাঁর আশা ছিল, আন্দোলনের ঘোষণাই ব্রিটিশকে একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য করবে। **কংগ্রেসের শীর্ষ স্তরের নেতা আবুল কালাম আজাদের মতে, আন্দোলনের রূপরেখা সম্পর্কে গান্ধীর কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা আলোচনায় বসবে, তখনই সবাইকে গ্রেফতার করবে না— এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে তিনি কোনও নির্দেশাবলি রচনা করেননি** *(স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃঃ ৩১৫)*।

দুয়ের পাতায় দেখুন

ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্ট ও সিইও দপ্তর অভিযান

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশ। ১৪ জুলাই

রাজ্যে এস আই আর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে ৩৪ লক্ষের বেশি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এঁদের কেউই মৃত, স্থানান্তরিত বা একাধিক জায়গায় নাম আছে এমন ভোটার নন। এনুমারেশন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে, অ্যাডজুডিকেশন এবং ট্রাইব্যুনালের স্তর মিলে কয়েক দফায় নামগুলি বাতিল হয়েছে। এরা সকলেই ট্রাইবুনাল সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে আবেদন করেছেন, কিন্তু তাঁরা জানেন না কবে তাঁদের আবেদনের নিষ্পত্তি হবে। ইতিমধ্যে ট্রাইবুনালের ২ জন বিচারক পদত্যাগ করেছেন ও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে মাত্র ৩৮০০০ মতো ভোটারের বিচার নিষ্পত্তি হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ট্রাইবুনালের বিচার শেষ করে অতিদ্রুত সমস্ত নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় তোলার দাবিতে ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি ১৪ জুলাই ডাক দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের সিইও দপ্তর অভিযানের। শিয়ালদা ও হাওড়া থেকে মিছিল করে হাজার

আটের পাতায় দেখুন

ফুটবলেও মার্কিন দাদাগিরি

ফুটবল মানেই এক অদ্ভুত জাদু। জাত-পাত, ধর্ম বা ভাষার কোনও ভেদাভেদ এখানে থাকে না। লাতিন আমেরিকার কোনও বস্তির ছেলে, আফ্রিকার ধূলি-ধূসরিত মাঠের কিশোর কিংবা বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের ফুটবলপ্রেমী— সবাই একটা বলের পেছনে ছুটে একই আনন্দে মেতে ওঠে। তাই ফুটবলকে বলা হয়, 'গরিব মানুষের খেলা', শ্রমজীবী মানুষের ঘাম আর কান্নায় ভেজা এক গভীর আবেগ। কিন্তু, মানুষের এই আবেগকেই আজ ব্যবসার হাতিয়ার বানিয়ে ফেলেছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর মাটিতে আয়োজিত ২০২৬-এর ফুটবল বিশ্বকাপে সর্বত্র পুঁজির দাপট, কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রণ, সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি।

খেলার আনন্দ গ্রাস করেছে বহুজাতিক পুঁজি

ফুটবল বিশ্বকাপের নির্মল আনন্দকে আজ গ্রাস করেছে ফিফা ও বহুজাতিক কর্পোরেটগুলোর আগ্রাসী মুনাফার হিসেবনিকেশ। ফিফার লক্ষ্য এ

সাতের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট
সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ
স্মরণ দিবসে

সমাবেশ

প্রধান বক্তা
কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি
কমরেড অসিত ভট্টাচার্য
স্থান ঃ রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ
বেলা ২-৩০

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

হিন্দু মহাসভা-মুসলিম লিগ এক সুর

একের পাতার পর

নেতৃত্বের ডাক ছাড়াই আন্দোলনে দেশের মানুষ

বাস্তবে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৯৪০-এ রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলন থেকে দেশজোড়া আন্দোলন গড়ে তোলার যে ডাক ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল তা দেশের মানুষকে উদ্বেল করে তুলেছিল। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার পরিবর্তে পর দিন ৯ আগস্ট ভোরেই গান্ধীজি এবং এআইসিসি-র সব নেতাকে গ্রেফতার করে। সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই, মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। বাস্তবে কংগ্রেস নেতৃত্বের কোনও নির্দেশ ছাড়াই দেশ জুড়ে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, ব্রিটিশ শাসনকে অচল করে দিতে মরিয়া সংগ্রামে সামিল হয়। সারা বাংলা জুড়ে ছাত্র যুবক মহিলা কিশোর কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের বিপুল অংশগ্রহণে আন্দোলন গণচরিত্র নেয়। দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন, ট্রেন-স্টেশন, সরকারি অফিস, পোস্ট অফিস জনতা দখল করে নেয় অথবা পুড়িয়ে দেয়। রাস্তা কেটে, রেললাইন উপড়ে ফেলে, টেলিগ্রাফের তার কেটে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সর্বত্র বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা বের হয় যেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারের সীমাহীন কঠোরতা ও অমানুষিক অত্যাচার জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। পরিণতিতে আন্দোলন 'অহিংসা'র সীমা অতিক্রম করে যায়। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি সহ স্বদেশি সংগঠনগুলি, যারা আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তাদের প্রায় সব নেতাদেরই গ্রেফতার করে আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করে ব্রিটিশ। মেদিনীপুরে আন্দোলন সবচেয়ে তীব্র রূপ নেয়। সর্বত্র থানা ও সরকারি কার্যালয়গুলি কোথাও আন্দোলনকারীরা দখল করে নেয়, কোথাও আগুন লাগিয়ে দেয়। মেদিনীপুরে পটাশপুর, সুতাহাটা, খেজুরি থানা আন্দোলনকারীদের দখলে চলে যায়। মহিষাদল, ভগবানপুরে পুলিশের আক্রমণে বিদ্রোহীদের পিছু হঠতে হয়। তমলুকে শোভাযাত্রার উপর ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালালে ৭৩ বছরের বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা প্রাণ হারান। তমলুকে সতীশ সামন্তের নেতৃত্বে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠিত হয়। হুগলি, হাওড়া, বীরভূম, নদীয়া মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

৯ আগস্ট
ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৮৫তম দিবস উপযুক্ত মর্যাদায় পালন করুন
এস ইউ সি আই (সি)

আন্দোলন দেশজোড়া

সারা বাংলার সাথে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে মুম্বই, আমেদাবাদ, পুনা, পাটনা, ঢাকাতে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যের জেলায় জেলায় আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয়। উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, মহারাষ্ট্রের সাতারা প্রভৃতি অনেক জায়গায় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকরা জামশেদপুর, কানপুর, নাগপুর, আমেদাবাদ ও দিল্লিতে ধর্মঘট করে। কৃষকরা দলে দলে আন্দোলনে যোগ দেয়। বহু জায়গায় কৃষকরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়, জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শ্রেণি সংগ্রামের রূপ নেয়। উল্লেখ্য, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা ও অন্য হিন্দু সংগঠনগুলি এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল এবং আন্দোলন থেকে সংগঠন এবং সমর্থকদের দূরে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও ছ'মাস নেতৃত্বহীন অবস্থাতেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ইতিহাস তৈরি করে।

এই আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ শাসকদের পাশবিকতা ছিল সীমাহীন। তারা কঠোর থেকে কঠোরতর দমন-পীড়ন চালায়। সরকারি হিসাব অনুসারে '৪২-এর ৯ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ৬২,২২৯ জনকে গ্রেফতার করে, ভারতরক্ষা আইনে ১৮,০০০ জনকে নজরবন্দি করে। **পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে ১৪০ জন নিহত এবং লাঠি ও গুলিতে ১৬৩০ জন আহত হয়। নিঃসন্দেহে বাস্তব পরিসংখ্যান এর থেকে অনেক বেশি।** নেতৃত্ববিহীন জনতার সমস্ত বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ সত্ত্বেও মিলিটারি এবং পুলিশি বল প্রয়োগে এই বিদ্রোহ ধ্বংস করা হয়। এর ফলে স্বাধীনতার লড়াই অনেকখানি নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি— হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ শক্তিশালী হয়।

আন্দোলনে জনগণের কৃতিত্ব আত্মসাতের চেষ্টা কংগ্রেসের

কংগ্রেস নেতারা যত দিন জেলবন্দি ছিলেন তত দিন তাঁরা বলেছেন, আগস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই, এ কংগ্রেসের আন্দোলন নয়। জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, এআইসিসি বা গান্ধীজি কোনও আন্দোলন শুরু করেননি। নেহেরু আন্দোলনকে 'মূঢ় ও অকালোচিত' বলে *দেগে দেন (ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া)*। আন্দোলন হিংসাত্মক হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য জেলের মধ্যে গান্ধীজি ২১ দিন অনশন করলেন। অথচ বিস্ময়কর ভাবে, জেল থেকে বাইরে এসে আন্দোলনে মানুষের বিপুল অংশগ্রহণ দেখে কংগ্রেসের নেতারা 'আগস্ট আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব আমাদের' বলে আন্দোলনের জনগণের কৃতিত্বে ভাগ বসাতে চাইলেন। অথচ পরবর্তী প্রত্যেক নির্বাচনে কংগ্রেস যে বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল তার পিছনে ছিল এই আন্দোলনে শত শত অখ্যাত অজ্ঞাত দেশবাসীর আত্মদান, শত শত লাঞ্ছিত নারীর চোখের জল, সর্বস্ব পণ করা শত শত দরিদ্র কৃষকের অনমনীয় সঙ্কল্প। **বাস্তবে দেশের জনগণের লক্ষ্য যে স্বাধীনতা, সে লক্ষ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের ছিল না। তাঁরা চেয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক পুঁজির অংশ হিসাবে ভারতীয় পুঁজিপতিদের পরিচালনায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যার সাহায্যে ব্রিটিশের মতো একই ভাবে ভারতীয় পুঁজিপতিরা দেশের জনগণের উপর শোষণ-শাসন চালাতে পারে।**

কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন যে কোনও ভাবে ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়া গড়ে তুলতে ব্যগ্র, তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র আগস্ট সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্য জার্মানি থেকে দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানালেন। ৩১ আগস্ট ১৯৪২ তারিখে রেডিও ভাষণে তিনি বললেন, 'ভারতবর্ষের সংগ্রাম অবাধ গতিতে চলছে। এই আন্দোলন আগুনের মতো শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। ... আমাদের দেশে এখন যে আন্দোলন চলছে, তাকে অহিংস গেরিলা যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এই গেরিলা যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করার পথ অবলম্বন করতে হবে। ... ব্রিটিশ সমরপ্রচেষ্টা ধ্বংস করতে হবে। ব্রিটিশ শাসনকে অচল করে তুলতে হবে। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমস্ত কর দেওয়া বন্ধ করুন। সব কারখানাতেই শ্রমিকদের হয় অবস্থান ধর্মঘট করতে হবে কিংবা কাজে ইচ্ছা করে ঢিলে দিতে হবে। ছাত্ররা গেরিলা দল গঠন করে দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে ধ্বংসাত্মক কাজ আরম্ভ করবে।'

হিন্দু মহাসভার ভূমিকা

বিয়াল্লিশের স্বতঃস্ফূর্ত ও যৌবনোদীপ্ত এই বিদ্রোহকে হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। বললেন, 'আমি মনে করি না যে, গত তিন মাসের মধ্যে যে সব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতালাভে সহায়তা হবে' *(রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়)*। মর্যাদায় ভাস্বর এই বিদ্রোহকে শুধু 'উচ্ছৃঙ্খলতা' বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিকে অর্থাৎ ব্রিটিশকে সহযোগিতা করার কথাও তিনি বলেছেন। 'এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতবর্ষের ... জাতীয় গভর্নমেন্ট এমন ভাবে গঠিত হবে, যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতায় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়' (ওই)। শুধু শ্যামাপ্রসাদই নন, হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকারও বিয়াল্লিশ সালের আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ও মুসলিম বিরোধী প্রচারকে তীব্র করতে বলেছিলেন। তাই মহাসভার সদস্যদের স্থানীয় সংস্থায়, আইনসভায়, চাকরিতে যে যেখানে ছিলেন, তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে না সরে নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ দেন। তাঁর যুদ্ধকালীন স্লোগান ছিল 'রাজনীতির হিন্দুকরণ' এবং 'হিন্দুত্বের সামরিকীকরণ'।

ছয়ের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলায় মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে কমরেড করীন্দ্রনাথ মণ্ডল বার্ধক্যজনিত রোগে ১২ জুন নিজের বাড়িতে ৯৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ সরদার, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গুণসিন্ধু হালদার, বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মাধবী প্রামাণিক সহ দলের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

ছয়ের দশকের প্রথম দিকে দলের উদ্যোগে কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। অভাব অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম করেই তিনি দলের কাজ করেছেন এবং পরিবারের সকল ছেলেমেয়েকে দলে যুক্ত করা সহ বহু পরিবারকে দলের সমর্থকে পরিণত করেন। বিশেষ করে নির্বাচন ও দল পরিচালিত বিভিন্ন গণআন্দোলন গড়ে তোলার সময় কর্মীদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া এবং দলের বক্তব্য কর্মীরা যাতে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারে সে জন্য তিনি সবরকম সাহায্য করতেন। তৎকালীন সময়ে কংগ্রেসীরা তাঁর উপর শারীরিক নিগ্রহ করলেও তিনি বিচলিত হননি। পরবর্তীকালে একই ভাবে সিপিএম শাসনকালে কৃষ্ণচন্দ্রপুর এলাকায় শাসক দল ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করলেও তিনি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে গেছেন।

২৭ জুন কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড করীন্দ্রনাথ মণ্ডল লাল সেলাম

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি সিপিডিআরএস-এর

নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানী সোনম ওয়াংচুক দিল্লির যন্তর মন্তরে লাগাতার অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কুঞ্চে শ্রীধর ১৫ জুলাই এক বিবৃতিতে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন সরকারকে অবিলম্বে সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে।

মর্যাদাময় জীবন যাপনের একমাত্র রাস্তা জনগণের জন্য ন্যায়প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের অবিরত নিযুক্ত রাখা

শিবদাস ঘোষ

ফ্রিডম সংক্রান্ত বহু মনীষীর ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি আপনার মুখস্থ থাকতে পারে, কিন্তু ফ্রিডম তত্ত্বের যথার্থ মানে ততক্ষণ আপনার বোঝাই হল না, নেসেসিটির যথার্থ উপলব্ধি ততক্ষণ আপনার হয়নি, যতক্ষণ না নেসেসিটি বলতে আপনি যেটা বুঝেছেন সেই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সংগ্রামে নিয়োজিত হচ্ছেন। আর এই সংগ্রাম করার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে ফ্রিডমের উপলব্ধি আপনার মধ্যে প্রস্ফুটিত এবং প্রোজ্জ্বল হতে থাকে। যতক্ষণ আপনি এই সংগ্রামের মধ্যে নেই, ততক্ষণ আপনার বোঝা ভাসাভাসা থাকে এবং বোঝার মধ্যে অনেক ত্রুটি থেকে যায়। তার পরও যদি আপনি বলেন যা যুক্তিসঙ্গত এবং যা উচিত বলে মনে করি তার জন্য আমি কাজ করতে পারি না, যা অন্যায়, দুষ্ট, আমার পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করি তা আমি আঁকড়ে ধরেই থাকি, তা হলে আমি কি নিজেকে মনুষ্য পদবাচ্য র‍্যাশনাল বিইং

(বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব) ভাবতে পারি?

আপনারা কি এই কথাটার মানে বোঝেন যে, ইউ কানট ফাইট ফর ইওর ওন ফ্রিডম উইদাউট ফাইটিং ফর দ্য ফ্রিডম অফ আদারস (অন্যের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম না করলে নিজের স্বাধীনতার জন্য আপনি লড়তে পারেন না)। আগেও বহু ক্লাসে এ কথা আপনাদের বলেছি— এই ফ্রিডম কথাটা বুঝতে হবে কী ভাবে? বুঝতে হবে— তুমি যদি নিজে বিকাশলাভ করতে চাও, সমাজ বিকাশের জন্য তোমার যদি উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষা থাকে, সংস্কৃতিসম্পন্ন, রুচিসম্পন্ন, শালীনতা এবং মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপন করতে যথার্থই যদি তুমি চাও এবং মর্যাদা সম্পর্কে তোমার যদি কোনও ভ্রান্ত ধারণা না থাকে, মর্যাদা মানে টাকাপয়সা, মর্যাদা মানে আইসিএস অফিসার হওয়া, মর্যাদা মানে হাইকোর্টের জজ হওয়া, মর্যাদা মানে মিনিস্টার হওয়া, চিফ মিনিস্টার হওয়া, মর্যাদা মানে অ্যামবাসাডার (রাষ্ট্রদূত) হওয়া এবং গাড়িবাড়ি থাকা, লোকে আমাকে স্যার স্যার বলবে, এই রকম তোমার যদি ভাবনা না থাকে, মর্যাদা কথাটার যথার্থ উপলব্ধি যদি তোমার থাকে তা হলে এ সমাজে তার একটাই মানে। সেটা হচ্ছে, দ্য ওনলি ওয়ে টু লিড ইওর লাইফ ইন অ্যান অনারেবল ওয়ে ইজ টু এনগেজ ইওরসেলভস কনস্ট্যান্টলি ইন দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য মাসেস ফর জাস্টিস (মর্যাদাময় জীবন যাপনের একমাত্র রাস্তা হল জনগণের জন্য ন্যায়প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের অবিরত নিযুক্ত রাখা)। ইনজাস্টিসের (অন্যায়ের) বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং তাকে নিয়ে লড়াই করা এবং এই লড়াই সংগঠিত করার কাজে এবং সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়েই কেবল তুমি মর্যাদা এবং ডিগনিটিসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পার। বাকি সমস্ত রাস্তা হল সেল্ফ ডিসেপশন (আত্মপ্রতারণা), মর্যাদার নয়— অহম মাত্র। কারণ এ সমাজে ওয়াগন ব্রেকারের টাকায় সম্পত্তি করলেও মর্যাদা মেলে, ফুলের মালা মেলে। ডাকাতি-গুন্ডামির পয়সায় টাকাকড়ি হলে তারও কদর হয়। তারপরে সে এমএলএ, এমপি হয়, আর তা হয় পয়সার জোরে। তারপরে সে মিনিস্টার হয়। তারপরে তিনি বাণী দিতে থাকেন। তা তিনি যদি এ সব ঠুনকো মর্যাদায় আত্মসন্তুষ্টি পান তা হলে ফ্রিডম নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার কী?

'বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়'

গুন্ডা দমন আইন ঃ লক্ষ্য কারা

বিধানসভা ভোটের প্রচারে বার বার রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার কথা শোনা গেছে বিজেপি নেতাদের মুখে। জেতার পরও বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আইনের শাসন কায়েম করতে তাঁর সরকার 'গুন্ডামুক্ত বাংলা' গড়তে চায়। সেই উদ্দেশ্যে ২৯ জুন বিধানসভায় দুটি বিল পাশ করিয়েছেন তাঁরা। রাজ্যপালের অনুমোদন পেয়ে ১৩ জুলাই থেকে রাজ্যে ওই দুটি আইন চালুও হয়ে গেছে। বিল দুটির একটি 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬' এবং অপরটি 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬'।

গুন্ডামি, তোলাবাজি বন্ধ হোক, সমস্ত ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করে সরকার মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক, নারী নিরাপত্তা সহ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক— রাজ্যের এমন কেউ নেই যিনি এটা চান না। সদ্য-প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের আমলে তো বটেই, তারও আগে সিপিএম সরকারের শাসনকাল থেকে তোলাবাজি, ঘুষ, শাসক দলের ছাতার তলায় থাকা দুষ্কৃতীদের দাপট সহ অসংখ্য বেআইনি কাজ-কারবারে দীর্ঘ দিন ধরেই এ রাজ্যের মানুষ অতিষ্ঠ।

এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে গুন্ডাদমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা শুনলে রাজ্যবাসীর খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু তা করার জন্য নতুন আইনের আদৌ প্রয়োজন ছিল কি? এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় আইনের তো অভাব নেই! মানুষের অভিজ্ঞতা, আইন থাকলেও শাসক-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহৃত হয় না। তোলাবাজি, চুরি-দুর্নীতি তো দূর, খুন-ধর্ষণের মতো অপরাধে গ্রেফতার হওয়ার পরেও শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা দুষ্কৃতীরা বহাল তবিয়তে তাদের দুষ্কর্ম চালিয়ে যায়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে, নতুন সরকারের তো উচিত ছিল সেই আইনগুলিই যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা। তা না করে আবার নতুন আইন আনতে হচ্ছে কী উদ্দেশ্যে?

কী আছে এই জোড়া আইনে? এই আইনে জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার কিংবা ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের সম পদমর্যাদার কোনও অফিসার, কাউকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করলে, বা কেউ ভবিষ্যতে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, আতঙ্ক বা নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতে পারে, তাঁদের এমন ধারণা হলে, এক বছরের জন্য তাকে বন্দি করে রাখতে পারবেন তাঁরা। বলা হয়েছে, কাউকে এ ভাবে প্রতিরোধমূলক আটক করার নির্দেশ এলে রাজ্যের যে কোনও জায়গায় গ্রেফতারি পরোয়ানা বার করে তার ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করতে পারবে পুলিশ। আটক হওয়া মানুষটি বিচার চাইবেন কোথায়? না, রাজ্যের কোনও আদালতে তিনি বিচার চাইতে পারবেন না! হাইকোর্টের বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা পর্ষদ গড়ে দেবে সরকার। থাকবেন আরও দুই সদস্য। কোনও ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলক আটক করা হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে পর্ষদের কাছে ঘটনার রিপোর্ট পেশ করবে সরকার। পর্ষদ আবার, এই আটকের পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে কি না, নয় সপ্তাহের মধ্যে তা বিচার করে সরকারকে রিপোর্ট দেবে।

অর্থাৎ, কোনও অপরাধ না করা সত্ত্বেও, একজনকে শুধু পুলিশ-প্রশাসনের কোনও কর্তাব্যক্তির সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক মনে হয়েছে বলে, বা আগামী দিনে তিনি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন এমন সন্দেহ হয়েছে বলে তাঁকে এক বছর আটক হয়ে থাকতে হতে পারে! এই আইনে আটক হওয়া ব্যক্তিকে জামিন পাওয়ার সুযোগটুকু পর্যন্ত দেওয়া হবে না। পুলিশ-প্রশাসনের বড় অংশটির নির্লজ্জ দলদাসত্ব দেখে দেখে যে রাজ্যবাসী প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এমন আইন দেখে তাঁদের আতঙ্কিত হওয়ারই কথা। কেন্দ্রে এক দশকের বেশি বিজেপি শাসনের অভিজ্ঞতা বলে, সরকারের অন্যায় নীতির প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুললে, শাসক দলের নির্দেশে আন্দোলনকারীদের গলা টিপে ধরতে সরকারি কর্তারা এই আইন প্রয়োগ করবেন, এমন আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আরও মারাত্মক হল, এই আইনে বলা হয়েছে, গ্রেফতার হওয়া মানুষটি সরকার বা পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করতে পারবেন না। গ্রেফতারির বিরোধিতা করে আদালতে অভিযোগ পর্যন্ত জানানো যাবে না! অভিযোগ বিচারের দায়িত্ব থাকবে উপদেষ্টা পর্ষদের হাতে, যার সদস্যদের নির্বাচিত করবে খোদ সরকারি প্রশাসন!

কেন এমন আইন? সংবিধান অনুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার পর আদালতে পেশ করার কথা পুলিশের। সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার হিসাবে অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিচারকরা আইনের ভিত্তিতে অভিযোগের বিচার করেন। নতুন আইনে এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হল কী উদ্দেশ্যে? দেশের বিচারব্যবস্থাকে এড়িয়ে স্রেফ সন্দেহের বশে আটক হওয়া ব্যক্তির গ্রেফতারি যুক্তিসঙ্গত কি না, তা বিচারের ভার পর্ষদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যও বা কী? শুধু তাই নয়, নতুন আইন অনুযায়ী, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি পর্ষদে নিজের হয়ে সওয়াল করার জন্য উকিল পর্যন্ত নিয়োগ করতে পারবেন না! অর্থাৎ নতুন আইনে মানুষের সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারগুলি রক্ষার কোনও ব্যবস্থা থাকছে না! এই বুনিয়াদি সুরক্ষা ব্যবস্থাটুকু না থাকলে কোনও আইনকে কোনও ভাবেই গণতান্ত্রিক বলা চলে কি?

এই আইন পুলিশ-প্রশাসনের হাতে ইচ্ছেমতো যে কোনও জায়গায় যখন খুশি ঢুকে পড়ে তল্লাশি চালানো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ও গ্রেফতারির বিপুল ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যের বাসিন্দাদের একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরটিকে অবাধে পুলিশ-প্রশাসনের চোখের সামনে হাট করে খুলে দিয়েছে এই আইন এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলেও স্রেফ সন্দেহের বশেই তা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাদের। আইনের এই দানবীয় চেহারাই কি বলে দেয় না যে, নতুন আইনদুটির পিছনে আর যাই থাক, রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার সাধু উদ্দেশ্য নেই?

নতুন গুন্ডাদমন আইনে সমাজবিরোধী কাজের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, যে কাজ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে, তা সমাজবিরোধী কাজ। কিন্তু কে সমাজবিরোধী আর কে তা নয়, তা বিচারের দায়িত্ব এই আইনে যে ভাবে শুধু পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তা গণতন্ত্রের সমস্ত নিয়মের

সাতের পাতায় দেখুন

তেলের দাম বিশ্বে কমলেও ভারতের মানুষের ঘাড়ে বাড়তি দামের বোঝাই

তৈলাক্ত বাঁশে ওঠা-নামা নিয়ে কে সি নাগের অঙ্ক অনেকেই জানেন। কিন্তু তেলের দামের ওঠা-নামা নিয়ে লাভ-লোকসানের অঙ্ক অনেকেই মিলিয়ে দেখেন না। তেল কোম্পানিগুলির কত ক্ষতি হচ্ছে— তা নিয়ে যখন-তখন সাফাই গেয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। ইরান ও ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির সময় থেকে তেল কোম্পানিগুলির বিশাল ক্ষতির তথ্য দাখিল করছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলার থেকে কমে ৭০ ডলারের নিচে নেমে যাওয়ার পরও তাদের লোকসানের কাঁদুনি অব্যাহত থেকেছে। এখন আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু ও তেলের দাম ৮৫ ডলারে ওঠায় তাদের গলার জোর আরও বেড়েছে। তেল কোম্পানিগুলিকে স্বস্তি দিতে কেন্দ্রীয় সরকার তেলের উৎপাদন শুল্ক কমিয়েছে। অথচ তেলের দাম বাড়ায় সাধারণ মানুষ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সব জিনিসের দামবৃদ্ধিতে তাদের কী বিপুল সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, তা নিয়ে সরকারের কোনও মন্ত্রীকে উচ্চবাচ্য করতে দেখা যাচ্ছে না। এখানেই বিচার্য, সরকার কার স্বার্থ রক্ষা করছে—জনসাধারণের, নাকি একচেটিয়া মালিকদের?

ফেব্রুয়ারিতে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ লাগার পর থেকে অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে চার বারের বৃদ্ধিতে এক ধাক্কায় গ্যাসের দাম হয়েছে ৯৬৮ টাকা, কার্যত গ্রাহককে বহন খরচ ধরে ১০০০ টাকা গুনে দিতে হচ্ছে। পেট্রল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১১৩.৫১ টাকা ও ৯৯.৮২ টাকা।

যুদ্ধের প্রথম ধাপে হরমুজ প্রণালী বন্ধ ছিল, তাই তেল-গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হয়েছিল বলে প্রচার। সরকারের এই যুক্তি যদি সঠিক বলে ধরে নিতে হলেও প্রশ্ন ওঠে হরমুজ যখন খোলা ছিল, তেলের দাম অনেক কমলেও সেই সুরাহাটা সাধারণ মানুষকে সরকার দিল না কেন? সদিচ্ছা থাকলে সেই সময়টুকুতেও তো সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে দাম কমানোর জন্য তেল কোম্পানিগুলিকে নির্দেশ সরকার দিতে পারত। উল্টে তারা তখন যুক্তি দিয়েছে, এখন তেল-গ্যাসের দাম কমানো যাবে না। কারণ, তেল কোম্পানিগুলির মজুত তেল-গ্যাস দু'মাস আগে বাড়তি দামে কেনা। অথচ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের আবহে ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি রাশিয়া থেকে সস্তায় ব্যারেল ব্যারেল তেল কিনে কয়েক বছর যে বিপুল মুনাফা করেছে, তখনও তারা দেশের মানুষকে এতটুকু সুরাহা দেয়নি। উল্লেখ্য যে, তেল কোম্পানিগুলির ব্যালেন্স শিট কিন্তু লোকসানের কথা বলে না। সেখানে লেখা হয় 'আন্ডার রিকভারি' অর্থাৎ যতটা লাভ করার পরিকল্পনা ছিল ততটা করা যায়নি।

ক্ষতির গল্প শোনানো তেল কোম্পানিগুলির ব্যালেন্স শিটের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইন্ডিয়ান অয়েলের নিট মুনাফা ৩৬ হাজার ৮০২ কোটি টাকা। এই সংস্থা ও আরও দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম ও হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম মিলে মোট মুনাফা করেছে ৭৭ হাজার ২৮০ কোটি টাকা। সংস্থাগুলি গত অর্থবর্ষ থেকে দ্বিগুণেরও বেশি মুনাফা করেছে। বাকি সব বেসরকারি কোম্পানিও মুনাফা করেছে বিপুল।

রাশিয়া থেকে তেল কেনার বিষয়ে মার্কিন ছাড়পত্রের জন্য তাকিয়ে বসে থাকছে কেন ভারত সরকার? আসলে এখানেও রয়েছে বৃহৎ মালিকদের স্বার্থ। মার্কিন দোসর হিসাবে অস্ত্র ব্যবসায় আদানি, রিলায়েন্স, টাটাদের মতো একচেটিয়া মালিকদের বাজার নিশ্চিত করতে তেলের ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে মার্কিন চাপ কিছুটা মানতে হচ্ছে। এ ছাড়া ভেনেজুয়েলায় ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলির লগ্নির কথাও সরকারের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গ্যাস-তেল সঙ্কটের অজুহাতে গ্যাস কোম্পানিগুলি সম্প্রতি জানিয়েছে, তারা এ বার থেকে ১০ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বিক্রি করবে! এর জন্য ১৬০০ টাকার বেশি দিতে হবে গ্রাহককে। এখন গৃহস্থের সিলিন্ডারে ১৪.২ কেজি গ্যাস থাকে, যার দাম ৯৬৮ টাকা। ধীরে ধীরে এর সরবরাহ কমিয়ে গ্যাস কোম্পানিগুলি প্রায় দ্বিগুণ দামে ১০ কেজি সিলিন্ডার কিনতে গ্রাহকদের বাধ্য করবে, এটাই আসল লক্ষ্য। যদিও ঘরে-বাইরে চাপে পড়ে আপাতত ১০ কেজির সিলিন্ডার সংযোগ বন্ধ থাকার ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি।

পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ সরকারগুলির কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যে। সম্প্রতি তিনি হুমকি দিয়েছেন, রাশিয়া থেকে ভারত তেল আমদানি করলে আমেরিকা ভারতের উপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপাবে। এ জন্য মার্কিন কংগ্রেসে একটা বিলও পাশ করানো হচ্ছে। এর আগেও যে তিনি শুল্কযুদ্ধের খড়্গ চাপিয়েছিলেন ভারত সহ নানা দেশের উপর, তা যে মার্কিন ধনকুবের একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির মুনাফা-বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে, বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশে-বিদেশে জনসাধারণের উপর শোষণের খড়্গ নিয়ে নেমেছে যে একচেটিয়া পুঁজিমালিক ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকারগুলি, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে জনসাধারণকেই। এ ছাড়া বাঁচার আর কোনও সহজ পথ নেই।

শ্রমমন্ত্রীকে হোসিয়ারি শ্রমিকদের দাবিপত্র

হোসিয়ারি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২৯ জুন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং দপ্তরের অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার আশিষ সরকারের সাথে দেখা করেও ওই দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইউনিয়নের উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সহকারী সম্পাদক অলোক অধিকারী প্রমুখ। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়— শ্রম দপ্তর ঘোষিত হোসিয়ারি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি অনুসারে বকেয়া ২০২৩ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ৭ বারের রেটবৃদ্ধি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। তার জন্য সমস্ত পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে সভা ডেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

নিট দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনশন আন্দোলনে সংহতি আর্ট ফোরামের

নিট ও নেট পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার, কঠোর শাস্তি ও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক সহ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-যুবকদের উদ্যোগে দিল্লির যন্তর মন্তরে যে অনশন আন্দোলন চলছে তার প্রতি সংহতি জানিয়ে 'পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আর্ট ফোরাম'-এর উদ্যোগে ১১ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরে মেছেদার শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে শিল্প কর্মশালা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন আর্ট ফোরামের কো-অর্ডিনেটর স্বপন জানা ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সংগঠক ডাঃ রিজাবুল হোসেন মল্লিক। আর্ট ফোরামের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সুকান্ত বর্মন ও পলাশ মাতা।

ছাত্রী খুন, ডোমজুড় থানায় বিক্ষোভ

হাওড়ার মৌড়িগ্রামের চাঁদনি বাগানে স্কুল থেকে ফেরার পথে ১৫ জুলাই এক ছাত্রী দুষ্কৃতীর হাতে নৃশংস ভাবে খুন হয়। ঘটনায় এলাকায় মহিলা ও ছাত্রীদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অভিভাবকরা মেয়েদের স্কুলে বা টিউশনে পাঠানো নিয়ে উদ্বিগ্ন। জনতা অভিযুক্তকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

এর প্রতিবাদে এআইএমএসএস ডোমজুড় থানায় বিক্ষোভ দেখিয়ে আইসি-কে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানায়— অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অবিলম্বে খুনের ধারা দিতে হবে, গার্লস স্কুলের বাইরে পুলিশ পিকেট বসাতে হবে, ডোমজুড় থানার সর্বত্র মদ, জুয়া, সাট্টার ঠেক বন্ধকরতে হবে।

এ ছাড়া আইসি-র মাধ্যমে সরকারের কাছে সংগঠন দাবি জানিয়েছে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফির প্রসার বন্ধকরতে হবে। নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রীতা ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অল ইন্ডিয়া কমিটির সদস্য কমরেড পুটনমালা।

বিড়ি শ্রমিকদের অত্যাধুনিক হাসপাতাল ও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার দাবি

বিড়ি শ্রমিকদের জন্য মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের হাসপাতাল সম্পর্কে বিধানসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘোষণা প্রসঙ্গে ২০ জুলাই এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের টাকায় ও উদ্যোগে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট যে হাসপাতাল ধুলিয়ানে তৈরি হয়েছিল তা চিকিৎসক, স্টাফ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ওষুধের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় অকার্যকর হয়ে আছে। আমরা আশা করি, বিধানসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বিড়ি শ্রমিকদের সুবিধার্থে এই হাসপাতালকে দ্রুত অত্যাধুনিক হাসপাতালে পরিণত করতে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

পশ্চিমবঙ্গের ২৩ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের মধ্যে ১২ লক্ষেরও বেশি বাস করেন মুর্শিদাবাদে। এই হাসপাতাল অত্যাধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত হলে জেলার গরিব বিড়ি শ্রমিকদের আধুনিক চিকিৎসা করানো সম্ভব হবে।

তাই প্রস্তাব অনুযায়ী দ্রুত ধুলিয়ান হাসপাতালকে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক হাসপাতালে পরিণত করার দাবি জানাই।

তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য যে সব 'স্ট্যাটিক কাম মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট' চালু হয়েছিল, সেগুলি বর্তমানে প্রায় বন্ধ। তা অবিলম্বে চালু করতে হবে। এ ছাড়াও পুরুলিয়ায় বিড়ি শ্রমিক হাসপাতাল সহ রাজ্যের সকল বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত মেডিকেল ক্লিনিকগুলোকে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সহ চালু করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিড়ি শিল্প থেকে সংগৃহীত জিএসটির টাকা থেকেই দেওয়া সম্ভব। আগে বিড়ি শিল্প থেকে যে পরিমাণ ট্যাক্সের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হত, জিএসটি চালু হওয়ার পর তার থেকে অনেক বেশি টাকা কোষাগারে জমা হচ্ছে। কিন্তু বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসা সহ অন্যান্য প্রকল্পে বরাদ্দ অনেক কমেছে।

এআইইউটিইউসি দাবি করেছে, বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের টাকা বাড়াতে হবে।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর সাবডিভিশনাল হাসপাতালে এক সাপে কাটা রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ডাক্তার নার্সদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ৭ জুলাই মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম, নার্সেস ইউনিটি এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের উদ্যোগে সুপারের দফতরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি তোলা হয়, অতি দ্রুত ওই রোগীর মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। এ ছাড়া জঙ্গিপুর সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে ও কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে, হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নতি করতে হবে।

দাবি মেনে সুপার দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি, জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের অর্থোপেডিক চিকিৎসক ডাঃ সুনীল হালদার ও বিশিষ্ট প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্বপন গায়েন, জেলা সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম সহ ১০ জনের প্রতিনিধি দল।

মিড-ডে মিলের ভার ইসকনকে ঃ প্রতিবাদ

১৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, মিড-ডে মিল প্রকল্পের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব কলকাতার পর নদিয়া সহ পর পর সারা রাজ্যে ইসকনকে দেওয়ার কথা। এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেন,

এর ফলে রাজ্যে মিড-ডে মিল প্রকল্পের প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার রন্ধন-কর্মী কাজ হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ খাবার থেকে বঞ্চিত হবে। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, মিড-ডে মিল কর্মীদের রান্না করা পুষ্টিকর গরম খাবার ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনের জন্য। তিনি আরও বলেন, মিড-ডে মিল কর্মীদের বছরে ১০ মাস নয়, ১২ মাসের বেতন দিতে হবে এবং অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের রন্ধন কর্মীদের সমান বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বারুইপুরে মহিলা সম্মেলন

১২ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এআইএমএসএসের বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার প্রথম মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ বারাসাত সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ে কমরেড দীপ্তি সরকার মঞ্চে। কুলতলী, জয়নগর ও বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মোট ২৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনন্যা নাইয়া, অবিভক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড মাধবী প্রামাণিক, রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্ত এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন এবং রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান বক্তারা। সবশেষে রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্ত আরএসএস-বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরির রাজনীতি, প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নারী নির্যাতন ও নারীর অসম্মানের চেষ্টা এবং নেতাজি সহ নবজাগরণের মনীষী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের ভুলিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র নারী সমাজকে একত্রিত হয়ে তীব্র লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান। কমরেড মৃন্ময়ী শাসমলকে সভাপতি ও কমরেড সীমা পণ্ডাকে সম্পাদক করে ৩০ জন কাউন্সিল সদস্য সহ মোট ৬২ জনের কমিটি গঠিত হয়।

সরকারি অবহেলাতেই ডিপিএলে শ্রমিক মৃত্যু

এ আই ইউ টি ইউ সি

১৫ জুলাই সকালে রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থা দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেডে (ডিপিএল) কুলিং টাওয়ার থেকে পড়ে উমেশ সাউ ও সিন্টুকুমার ঘোষ নামের ২ জন ঠিকাকর্মীর মৃত্যু হয়। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন,

এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল রাজ্যে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তার সামান্যতম ব্যবস্থাও নেই। ২০০ ফুট উঁচুতে কাজ করার জন্য যে গুণমানের সেফটি বেল্ট প্রয়োজন, তা এ ক্ষেত্রে ছিল না বলেই এই দুর্ঘটনা। অত্যন্ত নিম্নমানের সেফটি বেল্ট না হলে, দুজন শ্রমিকের সেফটি বেল্ট ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে পারত না। আমাদের দেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের যতটুকু নিরাপত্তা প্রাপ্য তা অধিক মুনাফার লোভে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে দেওয়া হয় না— এ কথা সবাই জানে। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদেরও আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা যে নেই, এই ঘটনা তা আবারও দেখাল। অবিলম্বে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নিহত শ্রমিক পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজনকে স্থায়ী চাকরি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং রাজ্য শ্রম দপ্তরের সক্রিয় নজরদারির দাবি জানান তিনি।

ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন ও নারী পাচারের বিরুদ্ধে এআইএমএসএস-এর ডাকে ১৫ জুলাই দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবসে ত্রিপুরার আগরতলায় বিক্ষোভ

নাগরিক সমস্যা নিয়ে পশ্চিম দিল্লিতে সভা

এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিম দিল্লি জেলা কমিটির উদ্যোগে ১২ জুলাই শাহ অডিটোরিয়ামে নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করা, বিভিন্ন কলোনির আইনি স্বীকৃতি দেওয়া, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, জলনিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ব্যবস্থা সুসংহত করা প্রভৃতি দাবিতে এই সভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ অধ্যাপক অপূর্বানন্দ, জেলা কমিটির সদস্য রমেশ পরাশর। সংযুক্তির নামে বিভিন্ন সরকারি স্কুল তুলে দেওয়া, নিট সহ নানা পরীক্ষায় দুর্নীতি, মাদক বৃদ্ধি এবং নারী নিরাপত্তার সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হন বক্তারা।

বিজেপি সরকারের কুশাসনের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভ

বিজেপি সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, পরিবহণ, খাদ্য সরবরাহ সহ মানুষের বেঁচে থাকার অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলিকে ক্রমাগত বেসরকারি হাতে বেচে দিচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, একের পর এক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ফলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। বস্তিবাসী, হকারদের নির্বিচার উচ্ছেদের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা ধ্বংস হচ্ছে। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে দুর্নীতি প্রশাসনের সর্বত্র মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নানা শহরে বিজেপি পরিচালিত সরকার ও পুরসভা জলের ওপর ট্যাক্স বসাচ্ছে। অথচ ইন্দোরের মতো শহরে দূষিত জলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে। এর বিরুদ্ধে ১৪ জুলাই মধ্যপ্রদেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। রাজ্যের নানা জেলায় ধরনা, মিছিল, বিক্ষোভ সভা ইত্যাদি হয়। জেলা কালেক্টরেটের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয় সর্বত্র।

এই সভাগুলিতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব, মহিলা, শিক্ষক, অধ্যাপক, অফিস কর্মচারী সহ সমাজের নানা স্তরের মানুষ যোগ দেন। ভোপাল, গুনা(ছবি), গোয়ালিয়র, ইন্দোর, সাগার, দেবাস, জবলপুর জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও ধরনায় বহু মানুষ অংশ নেন।

সংগ্রহ করুন

মালদায় সিপিডিআরএস-এর কনভেনশন

অমীমাংসিত ভোটারদের নাম দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে মালদা জেলা সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে ৪ জুলাই মালদা শহরে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক আখতার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইনজীবী মোহম্মদ জিয়াউল্লাহ।

প্রধান বক্তা সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক বর্তমান অবস্থা এবং এসআইআর-এর পিছনের ষড়যন্ত্র ব্যাখ্যা করেন। কনভেনশনে থেকে সুভাষ সরকারকে সম্পাদক এবং প্রশান্ত ঘোষকে সভাপতি করে কমিটি গঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১৫০ জন নাগরিক।

মধ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ভোপালে কমিউনিস্ট আরচণবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় ৫-৬ জুলাই। শিবির পরিচালনা করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও কমরেড সত্যবান এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল।

হিন্দু মহাসভা-মুসলিম লিগ এক সুর

দুয়ের পাতার পর

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ না নেওয়ার মূল তত্ত্বগত কারণ ব্যাখ্যা করেছেন আরএসএসের গুরুজি এম এস গোলওয়ালকর। বলেছেন, 'ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ও সাধারণ (কমন) বিপদের তত্ত্বগুলিকে নির্ভর করে আমাদের জাতিসংক্রান্ত ধারণার ভিত্তি গড়ে ওঠায় আমাদের বাস্তব হিন্দু জাতীয়তার ইতিবাচক ও প্রেরণাদায়ক নির্যাস থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু কর্মসূচিকেই কার্যত ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে পর্যবসিত করেছি। ব্রিটিশবিরোধী হওয়াকেই দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী হওয়া বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতাসংগ্রামের সমগ্র পর্যায়ের উপর এবং তার নেতাদের ও সাধারণ মানুষের ওপর বিপর্যয়কারী প্রভাব ফেলেছে' *(উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড, গোলওয়ালকর)*। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর সাধারণ শত্রু বা বিপদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হওয়া সত্ত্বেও গোলওয়ালকরজি তা মানতে নারাজ ছিলেন। ভৌগোলিক অখণ্ডতার ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদও তাঁর কাছে সমর্থনযোগ্য ছিল না। বাস্তবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র হলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি জোরদার হবে, স্বদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রাণবলি দেবে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ, এর ফলে 'হিন্দু জাতীয়তা'র নির্যাস নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই গোলওয়ালকরের কাছে ব্রিটিশবিরোধী হওয়া যথার্থ দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীর লক্ষণ নয়। সাধারণ বিপদ ব্রিটিশ শোষকদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম তাই 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ'-এর চোখে প্রতিক্রিয়াশীল। তাই বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন সহ গোটা স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে কর্মীদের সরিয়ে নিয়েছিল আরএসএস।

মুসলিম লিগের ভূমিকা

বাংলায় মুসলিম লিগ ও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকেই মুসলিম লিগের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপক ভাবে মাথাচাড়া দিতে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতে যুক্ত করার পরিবর্তে লিগের রাজনীতি বড় অংশের মুসলিমদের সেই স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। ১৯৩৯-এ প্রাদেশিক সরকারগুলি থেকে কংগ্রেসের পদত্যাগকে সুযোগ হিসাবে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশের সহায়তায় সেগুলির দখল নেয় লিগ এবং তার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে আরও পাকাপোক্ত করে তোলে। এ বছরই জিন্না পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব আনতে চেষ্টা করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে কোনও শক্তিশালী আন্দোলনের ডাক না দেওয়ায় সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বাড়তে থাকে, যা দেখে সুভাষচন্দ্র প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না এবং হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকরের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু সে আহ্বানে কোনও সাড়া মেলে না। ১৯৪০-এ লিগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পুরোপুরি বর্জন করে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে পাকিস্তান পাওয়াই জিন্নার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করতে ব্রিটিশ সরকারও লিগকে নানা ভাবে সহায়তা করতে থাকে এবং পাকিস্তান প্রশ্নে আশ্বস্ত করে।

লিগের দিল্লি অধিবেশনে (১৯৪৩) জিন্না ঘোষণা করেন, লিগ ব্রিটিশের সঙ্গে এখন কোনও সংঘর্ষে যাবে না। স্বাভাবিক ভাবেই লিগ ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। বাস্তবে ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রশ্নে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লিগের মধ্যে অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যায়।

সিপিআই-এর ভূমিকা

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন তথা আগস্ট অভ্যুত্থানের সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআইয়ের ভূমিকা কী ছিল? বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে সিপিআইয়ের অবস্থান ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। তখন রাশিয়া ও জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ। জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে লিপ্ত। এই সময় সিপিআইয়ের বক্তব্য ঃ 'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়— এ হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।' ১৯৪১-এর ২২ জুন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে। এর পরও বেশ কিছু দিন সিপিআইয়ের বক্তব্য অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৪১-এর জুলাইয়ে সিপিআইয়ের পলিটবুরো প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হয়, 'ব্রিটিশ সরকার ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব আগে যেমন ছিল, তেমনই আছে' *(ভারতে কমুনিজম, অমলেন্দু ঘোষ)*। এর পরই সিপিআইয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। নেতারা সিদ্ধান্তে আসেন, যুদ্ধে মিত্রশক্তির অন্যতম ব্রিটেনকে সহযোগিতা করলেই রাশিয়াকে সহযোগিতা করা যাবে এবং সাথে সাথে তাদের যুদ্ধ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঠিক বিপরীত মেরুতে পৌঁছে যায়। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' 'জনযুদ্ধ'তে পরিণত হয়ে যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার কর্মসূচি পরিবর্তিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতায় পরিণত হয়ে যায়। বাস্তবে দলটি যদি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হত, নেতাদের যদি নিজস্ব মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণী ক্ষমতা থাকত, তবে নিজেরা পরিস্থিতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

ব্রিটিশকে সিপিআইয়ের সহযোগিতা

১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল সিপিআইয়ের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি গোপন স্মারকলিপি এন এফ যোশী, হিন্দু মহাসভার নেতা এম এস অ্যানে এবং মারাঠি লেখক এস ওয়াই দেশপাণ্ডের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। সেই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, 'বর্তমান সরকারের অধীনে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সবরকম ভাবে সহযোগিতা করতে ভারতীয় কমিউনিস্টরা প্রস্তুত। ... আমরা এই যুদ্ধকে আমাদের যুদ্ধ মনে করি। তাই উৎপাদনের চাকাকে কিছুতেই থামতে দেব না, ... ধর্মঘট কমিয়ে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার নীতি যতটা সাধ্য রূপ দেব। ... বরং আমাদের কমরেডদের মুক্তি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দিলে আমরা উৎপাদনের গতি বাড়ানোর স্কিম নেব' (অরুণ শৌরির নিবন্ধ, দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, ১৮-২৪ মার্চ, ১৯৮৪)।

এর পর সিপিআই সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী ১৯৪২-এর ১২ মে দিল্লিতে ইন্টেলিজেন্স বুরোর সিনিয়র অফিসার জি আমেদ এবং ১৪ মে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সাথে দেখা করে আলোচনা করেন। এর পর থেকে যোশী ও ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। ১৯৪২-এর ২৩ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সংগঠনগুলির ওপর থেকে ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। নেতারা ক্রমেই ছাড়া পেতে থাকেন। তাঁদের পত্রিকা বেশি ছাপার জন্য বিশেষ কনসেশনে পর্যাপ্ত কাগজ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

সিপিআইয়ের ব্রিটিশ সহযোগিতা সোভিয়েত নির্দেশে নয়

যুদ্ধের পরে সিপিআই নেতারা যখন স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুদ্ধের সময় তাঁদের ব্রিটিশকে সমর্থন করার কথা জানান, তার উত্তরে স্ট্যালিন সিপিআই নেতাদের ভর্ৎসনা করে বলেন, "আপনারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা পরিত্যাগ করে ব্রিটিশের সঙ্গে এক প্রকার সহযোগিতা করেছেন (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত, রণেন সেন)।'

এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ সিপিআইয়ের এই ভূমিকা দেখে বলেছেন, '১৯৪২ সালে যখন সমস্ত দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে, সেই গোটা আন্দোলনটাকেই জাপানি সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের দালাল আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়ে তাঁরা যে তার ঘোরতর বিরোধিতা করলেন তাই নয়, সেই জাতীয় অভ্যুত্থানের মুখে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ লড়ছিল, তাঁরা ফ্যাসিবাদকে রোখার নামে কার্যত সেই সাম্রাজ্যবাদেরই দালালি করেছেন। এই কাণ্ডটির ফলে সমগ্র দেশাত্মবোধক আন্দোলনের 'কারেন্ট' থেকে তাঁরা যে শুধু বিচ্ছিন্ন হলেন তাই নয়, দেশের দেশাত্মবোধক মনোভাবের সামনে কমিউনিজমের আদর্শকে তাঁরা মারাত্মকভাবে হেয় করে ফেললেন' *(কেন এসইউসি আই-কমিউনিস্ট ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল)*।

বাস্তবে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ, সিপিআই নেতারা যখন এমন কলঙ্কজনক ভূমিকা পালন করে চলেছেন তখন দেশের মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করার সাহস নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে কী দুর্দমনীয় শক্তি সঞ্চার করতে পারে, এই আন্দোলন তা দেখিয়ে দিয়েছে। কোনও প্রস্তুতি নেই, কোনও পরিকল্পনা নেই, আন্দোলন সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, স্বচ্ছ রাজনৈতিক চেতনা নেই, সামনে কোনও নেতা নেই, হাতে কোনও হাতিয়ার নেই— রয়েছে স্বাধীনতার তীব্র আকুতি, অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগের মানসিকতা। তা নিয়েই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনতা সাম্রাজ্যবাদী শাসনকাঠামোর ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়ে গেছে। সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাকে বর্বরতায় দমন করে দিতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু মুছে দিতে পারেনি তার ঐতিহাসিক শিক্ষাকে। সে দিন যদি একটি সত্যিকারের মার্ক্সবাদী বিপ্লবী শক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকত, দেশজোড়া আন্দোলনকারীদের সংগঠিত রূপ দিত, তবে সে দিনই হয়তো ব্রিটিশকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করা সম্ভব হত, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিও জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরির সুযোগ পেত না, দেশভাগের পরিস্থিতিও তৈরি হত না। কিন্তু বাস্তবে যা সম্ভব হয়নি— সেই ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতাই সম্ভব হত। বাস্তবে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ইতিহাস নিছক একটি আন্দোলনের ইতিহাস নয়, গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার এক বিরাট কষ্টিপাথর। এই কষ্টিপাথরে যাচাই করলেই এই দলগুলির চরিত্র দেশের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

মহান এই আন্দোলনের উৎস এবং অনুপ্রেরণা কী ছিল, তা জানতে দৃষ্টি দিতে হবে তার আগের আড়াই দশকের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে। সে ইতিহাস আগামীতে।

ফুটবলেও মার্কিন দাদাগিরি

একের পাতার পর

বারে বিশ্বকাপ থেকে ১১ বিলিয়ন (১,১০০ কোটি) মার্কিন ডলার আয় করা, যা ফুটবল ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড। এর মধ্যে শুধু টিকিট বিক্রি থেকেই প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার আসবে, বাকিটা আসবে স্পনসরশিপ এবং টেলিভিশন সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করে। টিকিটের বিপুল দাম, চাহিদা বাড়লে 'ডায়নামিক প্রাইসিং' ব্যবস্থায় টিকিটের দাম ভারতীয় মুদ্রায় ৩১ লাখ টাকার বেশি। এর সঙ্গে আছে 'হাইড্রেশন ব্রেক'-এর নামে অতিরিক্ত সময় দেওয়া। মূল উদ্দেশ্য, ওই সময় বিজ্ঞাপন দেখিয়ে টাকা রোজগার। বেশিরভাগ দেশের ফুটবলাররা এই ব্রেকের বিরোধিতা করলেও ফিফা শোনেনি।

বিশ্বজোড়া ফুটবলপ্রেমীদের আপত্তিটা ফিফা প্রচুর টাকা আয় করবে তার জন্য নয়, বরং মুনাফার লোভের কাছে ফুটবলের আবেগ, ঐতিহ্য এবং সাধারণ দর্শকদের অধিকারকে বলি দেওয়া হচ্ছে বলে।

সবার জন্য উন্মুক্ত নয় এই বিশ্বমঞ্চ

ফিফা বলছে, 'ফুটবল ইউনাইটস দ্য ওয়ার্ল্ড'— ফুটবল বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু বাস্তবে আমেরিকার কঠোর ভিসা নীতি এবং রাজনৈতিক দাদাগিরি এই ক্রীড়া উৎসবকে একটি চরম বৈষম্যমূলক ও বিতর্কিত আসরে রূপান্তরিত করেছে। মুক্ত ফুটবলের স্লোগানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমেরিকার এই নীতি বিশ্বকাপকে কেবল পশ্চিমী ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কিছু দেশের 'একচেটিয়া সম্পত্তিতে' পরিণত করেছে। রাজনীতি ও কূটনীতির নোংরা মারপ্যাঁচে খোদ খেলোয়াড় এবং ম্যাচ অফিশিয়ালদের পেশাদারিত্বের ক্ষতি করা হয়েছে। ইরান দলের অনেকের ভিসা বাতিল করেছে আমেরিকা। ইরানের লড়াইটা শুধু মাঠের এগারো জন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধেও। ইরানি দলকে আমেরিকায় ৪৮ ঘণ্টার বেশি থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়েই ইরান দলকে থাকতে হয়েছে মেক্সিকোর তিজুয়ানায়। সেখান থেকে তাদের যাতায়াত করে খেলতে হয়েছে। ইরানের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এবং সাপোর্ট স্টাফকে দলের সঙ্গে আসতেই দেয়নি মার্কিন কর্তারা। ইরাকের তারকা আইমেন হুসেইনকে বিমানবন্দরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপরাধীর মতো জেরা করা হয়েছে। ২০২৫ সালের আফ্রিকার সেরা রেফারি সোমালিয়ার তারকা ওমর আরতানকে মায়ামি বিমানবন্দর থেকে অপমানজনক ভাবে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। সেনেগাল বা উজবেকিস্তানের খেলোয়াড়দের ওপর চালানো 'অতিরিক্ত তল্লাশি' বিশ্ব জুড়ে জাতিগত বৈষম্যের বিতর্ককে তীব্র করেছে। মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকার ৩৯টি দেশের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে ওই অঞ্চলের ফুটবলপ্রেমীদের স্টেডিয়াম থেকে কার্যত নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। টিকিট কেনার পরেও স্কটল্যান্ডের দর্শকদের ট্রাভেল পারমিট বাতিল করা হয়েছে। এমনকি সহ আয়োজক দেশ কানাডার প্রায় ৭০ শতাংশ সমর্থকের ভিসা বাতিল করেছে আমেরিকা।

লাগামহীন বর্ণবাদও মাথা চাড়া দিয়েছে। মাঠে ও মাঠের বাইরে ফুটবলারদের লক্ষ্য করে সামাজিক মাধ্যমে ঘৃণ্য বর্ণবাদী আক্রমণের প্রাবল্য এ বার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

খেলার মাঠে আধিপত্যবাদের নোংরা খেলা

২০২৬ বিশ্বকাপে আমেরিকার ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যবাদী নীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কঙ্গোর ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতীক কিংবা আয়ারল্যান্ডের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী 'সেল্টিক ক্রস' দেশদুটির কোটি কোটি মানুষের আত্মত্যাগ ও সার্বভৌমত্বের গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মারক। ফিফা এই দুই দেশের জার্সিতে এগুলো নিষিদ্ধ করে তাদের জাতীয় আবেগ ও সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসকেই অপমান করেছে। কঙ্গো ও আয়ারল্যান্ডের জার্সিতে এই প্রতীকগুলো থাকলে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের অতীত ঔপনিবেশিক নির্যাতন ও শোষণের কালো ইতিহাস বিশ্বমঞ্চে নতুন করে আলোচনায় আসত। পশ্চিমী প্রভাবশালী দেশগুলোর এই অস্বস্তি আর অপরাধ ঢাকতেই তাদের চাপে ফিফা এগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে বলেই অনেকের মত। ফিফার এই নীতিটি আসলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের চাপের কাছে নতিস্বীকার। পশ্চিমী বিশ্ব যখন রাজনৈতিক বার্তা তুলে ধরতে বিশেষ আর্মব্যান্ড পরে, ফিফা তখন নীরব সমর্থন দেয়। অথচ আফ্রিকা বা অন্য অঞ্চলের দেশগুলি নিজেদের স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরলেই ফিফা 'রাজনীতি'র অজুহাতে তা আটকে দেয়। ফুটবল তথাকথিত 'রাজনীতিমুক্ত' রাখার ফিফার নিয়মটি আসলে চরম বৈষম্যমূলক।

ক্ষমতার কাছে ফিফার আত্মসমর্পণ কলঙ্কিত ফুটবলের নিরপেক্ষতা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তোষামোদ করে বাড়তি রোজগারের আশায় ফিফা তাঁকে 'শান্তি' পুরস্কার দিয়েছে শুধু নয়, তাঁর চাপে মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ডের নিষেধাজ্ঞা মকুব করে নজিরবিহীন ভাবে বেলজিয়ামের সঙ্গে খেলার অনুমতিও দেয়। আয়োজক দেশ আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ফিফার এই নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ সারা বিশ্ব জুড়ে প্রবল সমালোচিত হয়েছে। ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা এই সিদ্ধান্তকে ফিফার লাল রেখা বা রেডলাইন ক্রস বলে অভিহিত করেছে।

ফুটবল হোক মানুষের

এ বারের বিশ্বকাপ ফুটবল আমাদের এক গভীর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফিফা কি আর ক্রীড়া সংস্থা আছে নাকি এটি পুরোদস্তুর এক মুনাফালোভী বহুজাতিক কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে? পুঁজির আগ্রাসন ফিফার মাধ্যমে ফুটবলকে একটি বিপুল মুনাফার পণ্য বানিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আমরা ভুলে যেতে পারি না, ফুটবলের আসল প্রাণ কোনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেট বক্সে থাকে না। তার প্রাণ লুকিয়ে আছে পাড়ার গলিতে, কাদার মাঠে আর কোটি কোটি মানুষের নিঃস্বার্থ ভালবাসায়। বহুজাতিক পুঁজির এই শৃঙ্খল থেকে ফুটবলকে মুক্ত করার সময় এসেছে। খেলাকে তার আসল মালিক, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং মাঠের ভেতরের সত্য ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিশ্ব জুড়ে আওয়াজ তোলা আজ ভীষণ জরুরি।

ফুটবল মানুষের খেলা, তাকে পুঁজির দখলদারি থেকে মুক্ত না করতে পারলে তার প্রাণ এ ভাবেই লুণ্ঠিত হবে। তাই গ্যালারিতেও আওয়াজ উঠুক— খেলাকে পুঁজির দখলমুক্ত করতে নতুন সমাজ গড়ো।

লক্ষ্য কারা

তিনের পাতার পর

বিরোধী। এ ক্ষেত্রেও শাসক দলের অনুগত পুলিশ-প্রশাসন, অন্যায় সরকারি নীতির বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললে তাঁকে যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত করবে না— এ গ্যারান্টি কে দেবে! একই যুক্তিতে সরকারের দমন-পীড়নের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনকেও আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলে দাগিয়ে দিয়ে নির্মম ভাবে তা দমন করার ক্ষমতা এই আইনে তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের হাতে।

দ্বিতীয় আইনটিতে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি যদি কোনও বেআইনি সমাবেশ, জন-অস্থিরতা, প্রতিবাদ বা শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কাজ করে, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তা হলে তাঁর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। বাস্তবে এর মধ্যে দিয়ে যে কোনও গণআন্দোলনকে এই সব অভিযোগে দাগিয়ে দেওয়ার এবং আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার ক্ষমতা পুলিশ-প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হল। ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ-আন্দোলন ও দুষ্কৃতীদের উচ্ছৃঙ্খল শৃঙ্খলাভঙ্গের মধ্যে পার্থক্য বিচার করার দায়িত্ব যদি পুলিশ-প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে বাস্তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের কথা বলার এবং প্রতিবাদ করার অধিকার বলেই কিছু থাকে না। নতুন আইনের জোরে শাসক দলের নির্দেশ মতো অতি সহজেই যে কোনও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে পুলিশ-প্রশাসন বেআইনি বলে ঘোষণা করতে পারবে। ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার নামে প্রতিবাদী ব্যক্তি, সরকারের কোনও অপকর্মের প্রতিবাদে বা ন্যায়বিচারের দাবিতে ফুঁসে ওঠা জনবিক্ষোভে শামিল হওয়া ব্যক্তিবর্গ বা রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীদের শায়েস্তা করতে এই আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার হওয়ার বিরাট আশঙ্কা রয়েছে। এ আশঙ্কা আরও দৃঢ় হয় যখন দেখা যায়, কারখানা সম্প্রসারণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছেন, দাবি আদায়ের নামে শিল্প সংস্থায় হুজ্জুতি করলে থাকতে হবে হাজতে। গুন্ডাদমন আইন কাজে লাগিয়ে আদায় করা হবে জরিমানাও (বর্তমান, ১৮ জুলাই '২৬)। অর্থাৎ গুন্ডাদমন আইনের জোরে শ্রমিক আন্দোলনকে গুন্ডামি বলে দাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে দিল রাজ্যের বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু একবারও এ কথা বললেন না যে, কোনও মালিক শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-পাওনা না দিলে, অতিরিক্ত সময় খাটালে, সেই মালিকের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হবে! ফলে কোন শ্রেণির মানুষের দিকে নিশানা করে বিজেপি সরকার এই আইন আনল, তা বোঝা কঠিন নয়। পরাধীন ভারতবাসীকে অত্যাচারের বুটের তলায় রাখতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক যে রাওলাট আইন এনেছিল, গুন্ডাদমনের সাম্প্রতিক এই জোড়া আইন সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনছে।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী কি সত্যিই আইনের শাসন কয়েম করতে চান? তা হলে নিষ্ক্রিয় পুলিশকে সামনে রেখে যে ভাবে বিজেপি সমর্থকরা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দিকে প্রায় প্রতিদিনই ডিম এমনকি পাথর পর্যন্ত ছুড়ছে, তা তিনি অবাধে চলতে দিতেন কি? নাকি যেহেতু হামলার লক্ষ্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা, তাই এই সব ঘটনায় নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক বা ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে বলে তাঁদের মনে হয় না! তা ছাড়া পুলিশ যে ভাবে প্রায়ই গ্রেফতার হওয়া বিরোধীদের অন্তর্বাস পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই বেআইনি কাজটিও তাঁদের বিচারে বোধহয় গণতান্ত্রিক কার্যকলাপই! নতুন জোড়া আইনে বিজেপি সরকারের সেই গণতান্ত্রিক চেতনারই বোধহয় প্রকাশ ঘটেছে!

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিজেপি সরকার রাজ্যে গুন্ডাদমন আইন কায়েম করতে চায়। অথচ বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে এবং গত দু'মাস ধরে এ রাজ্যেও বিজেপি সরকারের কার্যকলাপের মধ্যে আইনের পথে হেঁটে নাগরিকদের সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারগুলি রক্ষায় সচেষ্ট হওয়ার বদলে দমন-পীড়ন তথা 'গুন্ডাগিরি'র ছাপই প্রকট। বাস্তবে 'বুলডোজার' ও 'এনকাউন্টার'— এই শব্দদুটি আজ বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রীয় মদতে পুলিশ-প্রশাসনের বেআইনি গুন্ডাবাজির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দু'মাসে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষও তার সাক্ষী। সূর্যপুরে বালিকা ধর্ষণ-খুনের সাম্প্রতিক ঘটনাতেও দেখা যাচ্ছে, এলাকার তরুণরা— যাঁরা উদ্যোগী হয়ে অপরাধীদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, মেয়েটির দেহ উদ্ধার করেছিলেন এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও দলদাস ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, যখন তখন হানা দিয়ে পুলিশ তাদের একের পর এক গ্রেফতার করছে। ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যাপারে যতটা নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে তার চেয়ে অনেক বেশি গলা চড়াতে দেখা যাচ্ছে প্রতিবাদকারী নির্দোষ তরুণদের শায়েস্তা করার হুমকি দেওয়ার ক্ষেত্রে। তাঁদের অপরাধী বানাতে অবলীলায় তিনি রেললাইন ওপড়ানোর মতো অসত্য অভিযোগ পর্যন্ত তুলছেন, সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরির অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কোনও রকম তদন্ত হওয়ার আগেই সে দিনের ঘটনায় জনরোষে নিহত অভিযুক্তকে 'নির্দোষ' ঘোষণা করে ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনের কাজের ব্যবস্থা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী! কোন আইনের শাসন মেনে এ কাজ করলেন তিনি? আইন মেনে চললে তাঁর তো উচিত ছিল ওই অভিযুক্তের মৃত্যুর যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করা এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া। তা তিনি করলেন না। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁর আসল উদ্দেশ্য পুলিশের অপদার্থতার বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভকে হেয় করে প্রতিবাদীদের 'খুনি' সাব্যস্ত করা।

এই সব ঘটনায় রাজ্য যখন তোলপাড়, তখনও পর্যন্ত কিন্তু গুন্ডাদমনের নতুন আইন দুটি কিন্তু কার্যকর হয়নি। তা সত্ত্বেও সূর্যপুরের প্রতিবাদী যুবসমাজ— ধর্ম নির্বিশেষে এলাকার হতভাগ্য কন্যাটির নির্মম ধর্ষণ-হত্যা ও পুলিশের দলদাস ভূমিকার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবে যাঁরা সেদিন পথে নেমেছিলেন— তাঁদের ওপর বিজেপি সরকারের পুলিশের এই সরকারপোষিত গুন্ডামি দেখে নতুন গুন্ডাদমন আইনদুটির অপপ্রয়োগ সম্পর্কে আশঙ্কা না জেগে পারে না।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 47 Bengali Weekly 24 July, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে ফুলবাড়ির রামনগর মজদুর বস্তিতে প্রায় ৫০০ পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিস দেয় প্রশাসন। রামনগর মজদুর বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী নাগরিক কমিটির ডাকে নাগরিকরা ১৩ জুলাই ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন। কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক আশীষ রায় বলেন, এই বস্তির অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। তারা দিন আনে দিন খায়। কোনওমতে সংসার চালাতেই নাভিশ্বাস উঠছে, তার উপর উচ্ছেদ হলে তাঁরা যাবেন কোথায়? এ দিনের বিক্ষোভে শত শত মানুষ উপযুক্ত পুর্নবাসনের দাবি জানান।

হলদিয়ায় গ্যাস লিক ঃ ক্ষতিপূরণের দাবি

৩০ জুন হলদিয়ার পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টের পাইপলাইন থেকে ন্যাপথা লিক করে বিশাল এলাকা জুড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ২২ জন অগ্নিদগ্ধের মধ্যে দু'জন মারা যান। এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ফণিভূষণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে বাসিন্দা ও কারখানার কর্মীদের সাথে কথা বলেন।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দাহ্য পদার্থের পাইপলাইন মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া, কোম্পানির নিজস্ব অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, নিহত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, দীর্ঘদিন তৈরি হয়ে পড়ে থাকা ইএসআই হাসপাতালটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করে অবিলম্বে চালু করা, হলদিয়া হাসপাতালে আধুনিক বার্ন ওয়ার্ড, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স সহ উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি দাবিতে ১৩ জুলাই হলদিয়ার এসডিও-কে দলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কলকাতা হাইকোর্ট ও সিইও দপ্তর অভিযান

একের পাতার পর

হাজার মানুষ রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হন। এই বিক্ষোভ সমাবেশে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা জানান, তাঁরা কী ভাবে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, আটক শিবির ও পুশব্যাকের আতঙ্কেঅসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সরকারি সুবিধা, রেশন, অন্নপূর্ণা যোজনা, আবাস যোজনা, জমিজমা রেজিস্ট্রি ইত্যাদি ব্যাহত ও বন্ধ হচ্ছে। অনেকেই অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেন, ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি ভোট হয়ে যাওয়ার পর এই অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত মানুষগুলির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। যদিও অনেকেই নির্বাচনের আগে বলেছিলেন ভোট শেষ হলে এক মাসের মধ্যে তাঁরা সকলের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দেবেন। এখন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট দেখাচ্ছেন। সকলের পক্ষে কি বিপুল টাকা খরচ করে কোর্টে যাওয়া সম্ভব? এই অবস্থায় ন্যায়বিচারের দাবিতে ভুক্তভোগীরা নিজেরাই সংগঠিত হয়ে তৈরি করেছেন সংগ্রাম ও দাবি আদায়ের হাতিয়ার 'ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ'। ব্লকে ব্লকে, জেলায় জেলায় গড়ে তুলেছেন সমিতির অসংখ্য শাখা। জেলায় জেলায় মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ, ব্লক-এসডিও-ডিএম অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমিতির অন্যতম আহ্বায়ক পূর্বতন শিক্ষক শিশির সরকার। বক্তব্য রাখেন শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক ও প্রবীণ সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা সুজাত ভদ্র, প্রাক্তন সাংসদ ও কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক ডাঃ তরুণ মণ্ডল, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী রণেন ধাড়া, সমিতির অন্যতম সংগঠক শঙ্কর ঘোষ এবং মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক।

দেড় লক্ষাধিক ডিলিটেড ভোটারের স্বাক্ষরিত আবেদন নিয়ে ডাঃ তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দাবিপত্র পেশ করেন। প্রাক্তন শিক্ষক শিশির সরকারের নেতৃত্বে আর এক প্রতিনিধিদল মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে দাবিপত্র পেশ করে সমস্ত ডিলিটেড ভোটারের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানান। তাঁরা বলেন, কোনও অজুহাতেই এঁদের সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। দুটি ক্ষেত্রেই এই দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সভায় নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্বাক্ষর সংগ্রহ, এলাকায় এলাকায় সমিতির শাখা কমিটি গঠন ও অন্যান্য আন্দোলনের কর্মসূচি চলবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনও প্রকৃত নাগরিক ও ভোটার, ভোটার তালিকার বাইরে থাকবে, তত দিন পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে এই আন্দোলন চলবে ও আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঝাড়খণ্ড রাজ্য পার্টির নতুন সম্পাদক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতির জীবনাবসানের পর কেন্দ্রীয় কমিটি নতুন রাজ্য সম্পাদক হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জীকে মনোনীত করেছে।

দিল্লিতে ছাত্রদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের নিন্দা

দেশ জুড়ে আন্দোলনের ডাক এআইডিএসও-র

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারির দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, নিট কেলেঙ্কারির তদন্ত ও এনটিএ-কে বাতিল করার দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্রছাত্রীদের যে অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি চলছিল, সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে বিজেপি সরকারের পুলিশ ১৮ জুলাই সকালে গায়ের জোরে তা উঠিয়ে দেয়। দমে না গিয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২০ জুলাই সংসদ ভবন অভিযানে সামিল হন। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ সহ সদস্যরাও এই অভিযানে অংশ নেন। এ দিন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের ওপর দিল্লি পুলিশ বর্বর লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে।

পুলিশি বর্বরতার তীব্র নিন্দা করে ২০ জুলাই এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শিবাশিস প্রহরাজ এক বিবৃতিতে বলেন, এই ঘটনা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কুৎসিত চেহারাটিকে জনসমক্ষে উদঘাটিত করে দিল। দেখিয়ে দিল, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ, তাদের জীবন ও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে তাদের সামান্য মাথাব্যথাও নেই। বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি সম্পূর্ণ বাতিল করা এবং নিট কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে বিচারপতিদের তত্ত্বাবধানে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করা হয়।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা ও তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশ জুড়ে শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে তৃণমূল স্তরে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান কমরেড প্রহরাজ।

দুই শ্রমিকের মৃত্যুতে রেলমন্ত্রীকে দাবিপত্র

১৪ জুলাই কোচবিহার জেলার ঘোড়াডাঙা এলাকায় রেললাইনের কালভার্টের কাজ চলাকালে আগাম সতর্কতা ছাড়া ওই লাইনে ট্রেন চলে আসায় ২ জন শ্রমিক মারা যান এবং ৩ জন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের যথাযথ নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক স্মারকলিপি পাঠান রেলমন্ত্রীকে।

রেলের ঠিকাদারের অধীনে ১১ জন শ্রমিক কাজ করার সময়ে কোনও রকম সতর্কতা ছাড়াই শ্রমিকদের লাইনে বঙ্গাইগাও-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস চলে আসায় দুর্ঘটনা ঘটে। এআইইউটিইউসি দাবি করে, রেল ও ঠিকাদারের যে গাফিলতির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তার তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মৃত শ্রমিক পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজন সদস্যকে রেলে স্থায়ী চাকরি, আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়া কোনও অবস্থায় রেলে ও ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের কাজ করানো চলবে না।

স্মার্ট মিটার পুড়িয়ে পাঁশকুড়ায় বিক্ষোভ

জনস্বার্থবিরোধী স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করতে, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির ষড়যন্ত্র রুখতে ও প্রতাপপুর সাপ্লাই এলাকায় ভয়াবহ লোডশেডিং-লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) পাঁশকুড়া জোনাল কমিটির ডাকে ১৭ জুলাই বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা প্রতাপপুর কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে সামনে প্রতীকী স্মার্ট মিটার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং স্টেশন ম্যানেজারকে ৮ দফা সংবলিত স্মারকলিপি দেন। শেষে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা পাঁশকুড়া স্টেশন বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com